সূচিপত্র

সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও দারিদ্র	১৫
প্রগতি এবং দারিদ্র	২২
ত্রাণ, পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	৩২
অস্থিরগতি অর্থনীতি	৩৯
সোনা নিয়ে ভাবনা	৪৭
কস্মৈ দেবায়	৫৫
আমদানি রপ্তানি ঘাটতি	৬৪
শিল্পনীতির রূপান্তর	৭১
আশি-র দশক	৮১
মজুরি, বেতন, আয়	৯৩
শিল্পপতির স্বর্গ	১০০
ঋণানুবন্ধ	১০৮
কালো টাকা ধূসর টাকা	১১৮
কালো টাকার সমীক্ষা	১২৪
পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাং	১৩৬
ব্যাঙ্কের বাইরে আমানত	১৪০
সপ্তম অর্থ কমিশন	১৪৮
অষ্টম অর্থ কমিশন	১৫৬
সারকারিয়া কমিশন	১৬৩
কেন্দ্রের ঘাটতি, রাজ্যের ওভারড্রাফট	১৭২
পথ ও বিপথ	১৭৬
সপ্তম পরিকল্পনা : পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত	১৮৪
সপ্তম পরিকল্পনা ১৯৮৫-১৯৯০	১৯৫

১.৫৩ কোটি, প্রাণহানি ৮১৩, গবাদি পশুর মৃত্যু ২ লক্ষ। এই ক্ষতি পুরোপুরি পূরণ করতে হলে ৫৬৪ কোটি টাকা যথেষ্ট হবে না। প্রাথমিক হিসাব অনুসারে শেষ পর্যন্ত প্রায় ২০০০ কোটি টাকা লাগতে পারে।

এই সব হিসাবই সম্ভবত পরে সংশোধিত করতে হতে পারে, কিন্তু সংশোধনের ফলে হিসাবগুলি বাড়বারই সম্ভাবনা। এই হিসাবের মধ্যে দুটি বড় জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর-আসানসোল থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ শিল্পাঞ্চলে বড় বড় কলকারখানাতে যে ক্ষতি হয়েছে, আশা করা যায় শিল্পের মালিকেরা নিজেরাই ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সঙ্গে ব্যবস্থা করে তার পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবেন। কিন্তু সরকারি সাহায্যে যে সব রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখা হয়েছে তাদের প্রয়োজনের দিকটা সরকারকেই দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত সঙ্গত কারণেই এই হিসাবের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব প্রশাসনিক কর্তৃত্বে যে-সব সংস্থা আছে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি ধরা হয়নি। রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, জাতীয় সড়ক, বড় সেচ ব্যবস্থা, কয়লাখনি ও ভারত সরকারের নিজস্ব শিল্প-কারখানা ইত্যাদিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যা টাকা দরকার হবে সেটা অবশ্যই ভারত সরকার নিজ দায়িত্বে বহন করবেন। এটা সহজেই বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হবে তার সামান্য ভগ্নাংশও তাঁদের রাজস্ব থেকে করা যাবে না। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরের বাজেটে প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছিল মাত্র ৯ কোটি টাকা। এই টাকাটা কতখানি অপর্যাপ্ত সেটা বোঝা যায়, যখন দেখা যায় যে এই খাতে ১৯৭৬-৭৭-এ খরচ হয়েছিল ১২.১৭ কোটি টাকা এবং ১৯৭৭-৭৮-এর সংশোধিত বাজেটে এর জন্য ধরা আছে ১১.৫৫ কোটি টাকা। গত দু বছরে কোনো বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়নি। তাতেও যদি বছরে প্রায় ১২ কোটি টাকা প্রয়োজন হয়, তা হলে এবারের বাজেট-বরাদ্দ ৯ কোটি টাকাতে কিছুই করা যাবে না। এটাও মনে রাখা দরকার যে ১৯৭৬-৭৭-এর মোট ১২ কোটি টাকার ব্যয়ের মধ্যে নানারকমের খয়রাতি সাহায্যের জন্য খরচ হয়েছিল ২.৮১ কোটি টাকা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য 'রিলিফ' ব্যয় হয়েছিল ৫.৫২ লক্ষ টাকা। এর ওপর ছিল প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিবিধ ব্যয়। এবারে যে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা আছে তার থেকে আবশ্যিক ব্যয়গুলি মেটাবার পরে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত ব্যয়ের জন্য রাজ্য সরকারের ব্যয়ের কতটা কেন্দ্রীয় অনুদানের হিসাবে আনা হবে এই নিয়ে অনেক আলোচনা ও প্রস্তাব হয়েছে।

তখন পাশাপাশি চলেছে। আবার লন্ডনে বসছে গোলটেবিল বৈঠক—ভারতের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য। কংগ্রেস প্রথমটা এই অধিবেশনে যোগ দেয়নি, কিন্তু গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে ১৯৩১-এ দ্বিতীয় বৈঠকে মহাত্মা যোগ দিলেন। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিসংবাদ সমাধানে মহাত্মা গান্ধী অনশন করলেন। ১৯৩০-এই সাইমন রিপোর্ট বেরিয়েছিল—সে রিপোর্ট আর গোলটেবিল আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি হল 'শ্বেত-পত্র'। ছাত্রসমাজ কখনো বিভ্রান্ত, কখনো সক্রিয়—অসহযোগে এবং চরমপন্থায় দুই পথেই।

১৯২৮-এ—আমরা যেবার আই এ পাশ করি—সাইমন কমিশনের কলকাতা আসার প্রতিবাদে ডাকা তেসরা ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রচণ্ড গোলমাল হয়। এর পরে একটা ক্ষমতাশালী ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে—নাম 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্ট্স্ অ্যাসোসিয়েশন' বা সংক্ষেপে এ বি এস এ। এর অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী ছাত্র প্রমোদ ঘোষাল (আই এস সি-তে প্রথম হয়েছিলেন), আর সঙ্গে ছিলেন শচীন মিত্র, অমর রায় এবং আরো অনেকে। সে সময়কার ছাত্র-নেতাদের মধ্যে যতীন চক্রবর্তী এখনো অনেক কিছুর পুরোভাগে—এখনো সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে একটি বিতর্কিত নাম। পরে এই সংগঠন ভেঙে যায়। সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যে বিরোধের ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেসে ভাঙন ধরে। ফলে এ বি এস এ-র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে জন্ম নিল 'বেঙ্গল প্রভিনসিয়্যাল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন' বা সংক্ষেপে বি পি এস এফ। ত্রিশের দশকের ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে সংক্ষেপে বি পি এস এফ। ত্রিশের দশকের ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে তখন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম শোনা যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক মন্দা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে কলকাতায়, তথা বঙ্গদেশে, একটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। নতুন লেখক, নতুন পত্রিকা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯১৮-তে স্পেংলার বলেছিলেন যে অর্থনৈতিক মন্দার সময়েই সৃজনী সাহিত্য গড়ে ওঠে। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব আসে, আবার সহানুভূতিও আসে। বাংলার সাহিত্যে কুড়ির দশকে একটা নতুন ধারা আমরা ছাত্রাবস্থায়ই দেখতে পেয়েছি। 'শেষ রোম্যান্টিক' মণীন্দ্রলাল বসু আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু 'কল্লোল', 'কালিকলম', ও 'প্রগতি'-তে গোকুল নাগ, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নতুন যুগের লেখক আমাদের বোঝালেন যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বাইরেও সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকের আর একটা

অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির উপরে বিশ্বাস করতে পারি না। আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম বহুকাল আগেই পরিহার করেছিলাম। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন ঈশ্বর মানি কিনা। উত্তর দিই—ঈশ্বরের এমন একটা সংজ্ঞা দেওয়া যায়, যাতে বলতে পারি যে ঈশ্বর মানি। বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ব শৃঙ্খলার পিছনে একটা শক্তি নিশ্চয়ই আছে, তাকে যদি ঈশ্বর নাম দিই তাহলে আপত্তি ওঠে না। এটা মানা-মানির কথা নয়, সংজ্ঞা-র কথা, কিন্তু নিজের মনকে যখন প্রশ্ন করি, এই শক্তি কার সৃষ্টি, তখন বাক্য নিবর্তিত হয়, মনের গোচরে কিছু পাওয়া যায় না। সমস্ত চিন্তা ঘোলাটে হয়ে যায়। মনকে পার্থিব সমস্যায় ফিরিয়ে আনি। যখন পার্থিব সমস্যা ওঠে—যেমন অমলার অসুস্থতায় বাড়াবাড়ি—তখন অনেকে বলেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। কিন্তু চাটুকারিতা প্রিয়, ভক্তজনের প্রতি কৃপাপূর্ণ, অন্যদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ ভগবানের কল্পনা কিছুতেই করতে পারি না। যে ঈশ্বর বা দেব-দেবীদের আমরা পুজো করি তাঁদের আমরা তৈরি করেছি জমিদার বা অফিসের বড় সাহেবের আদর্শে—যাঁরা তাঁর ভক্ত তাঁরাই তাঁর প্রিয়।

যদি সত্যি সত্যিই সমদর্শী ভগবান থাকতেন, তাহলে তিনি আমার বিচার করতেন আমার কাজ দেখে, আমার তোষামোদি শুনে নয়। কিন্তু সে ভগবান কোথায়? সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য যাঁর যুগে যুগে অবতীর্ণ হবার কথা, তিনি এই অধর্ম-পরিপূর্ণ জগতের দিকে কি একবারও তাকাচ্ছেন না? গীতা উপনিষদ বারবার পড়েছি, এগুলির সাহিত্যিকমূল্যে মুগ্ধ হয়েছি। কোনো কোনো যুক্তি পরিপূর্ণ সঙ্গত মনে হয়েছে—যেমন ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ এবং তার ফলে বুদ্ধিনাশ এবং সর্বনাশ—কিন্তু ভাষার সৌন্দর্যে এবং দার্শনিকতার ভারে দুর্বল যুক্তির দৌর্বল্য চাপা পড়ে গিয়েছে। আমি সবাইকে আগেই মেরে রেখেছি, অতএব তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, একথার পিছনে যুক্তি কোথায়? আমরা যদি সবাই 'পাপাত্মা, পাপসম্ভব' হই, তাহলে আর কিসের আশায় কী করি? আত্মার বিনাশ নেই, অতএব শরীর-হননে দোষ নেই, এই আপ্তবাক্য মন গ্রহণ করতে চায় না। আত্মা অবিনাশী কিনা এ প্রশ্নের উত্তর পাবার আগেই মনে প্রশ্ন জাগে আত্মা ব্যাপারটা কী?

অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, কিন্তু কোথাও মূল প্রশ্নের সদুত্তর পাইনি। ঈশ্বরহীন বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করতে পারিনি। ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে ছুটি নিলেন একথা শুনলে মনে